Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 233 – 240
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

গল্পে ব্যক্তিজীবনের নানাদিক : প্রসঙ্গ মীনাক্ষী সেন

দীপিকা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
ইমেইল : dipika.india1@gmail.com

Keyword
নকশাল, রাজনীতি, নারী নির্যাতন, স্মৃতিচারণা, লিঙ্গভেদ, ব্যক্তিজীবন, কারাগার, পরিবার-পরিজন, ক্ষমতায়ন।

Abstract
আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য তথা গল্পের জগতে বহুল পরিচিত না হলেও একেবারে অপরিচিত নয়, এমন একজন গল্পকার হলেন মীনাক্ষী সেন। তাঁর জন্ম দিল্লিতে, বেড়ে ওঠা কলকাতায়, কর্মক্ষেত্র ছিল ত্রিপুরা এবং সক্রিয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে ছিল সংযোগ। তাঁর জীবনে এমন ভৌগোলিক পরিধি তাঁর লেখনীর জগতকে করে তুলেছে প্রসারিত ও বিস্তৃত। সাহিত্যের সত্য ও জীবনের সত্য যে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে পারে তা বোধহয় মীনাক্ষী সেনের সৃষ্ট সাহিত্যজগত না দেখলে ভালভাবে বোঝা যায় না। 'স্পন্দন' পত্রিকার সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় –

> "সাহিত্যসত্যের সাথে জীবনসত্যের মিলন কতো গভীর হতে পারে, শ্রীমতী সেনের জেল-সংক্রান্ত গদ্যগুলিতে তার উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে"।

জেল-সংক্রান্ত গ্রন্থ *জেলের ভেতর জেল* তাঁর ব্যক্তিজীবনের চার বছর অতিক্রান্ত করার সময়পর্বে অন্তর্জীবন চেতনায় উঠে আসা অভিজ্ঞতার ফল বলা যেতে পারে। এছাড়া তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্পেও লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই গল্পের পটভূমি হয়ে উঠে এসেছে, যেখানে লেখক নিজেই হয়ে উঠেছেন গল্পের কোনও চরিত্র, কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও বা অন্য কোনও নামের আড়ালে। এমনই কতগুলি গল্প হল – 'পাতালকন্যা', 'হারজিত', 'মামিমা', 'স্বর্গের দুয়ার', 'বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি', 'সূর্যসম্ভব', 'টুটুবাবু উকিলের গাঁজাখুরি গল্প' ইত্যাদি।

মীনাক্ষী সেনের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন একই সুতোয় বাঁধা, যা উপরোক্ত বিভিন্ন গল্পের দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। এমনই একটি গল্প হল 'বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি'। গল্পটিতে দেখা যায়, লেখকের বাবা পনের কাঠা জমি কিনেছেন। আশা ছিল, তাতে একটি বাড়ি করে সবাই মিলে থাকবেন। কিন্তু সমকালীন বিভিন্ন সমস্যার কারণে সেখানে আর বাড়ি করা হওয়া উঠেনি। যা আজও বেলঘরিয়াতে রয়েছে। তবে গল্পটি ও তার পাশাপাশি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা* গ্রন্থের 'মীনাক্ষী সেনের কথা', লেখককে ঘিরে রচিত বিভিন্ন স্মৃতিকথা, 'ইলা সেনগুপ্তের আত্মকথন', লেখকের পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যাদির নিরিখে লক্ষ করা যায় গল্পটির কাহিনী লেখকের জীবনের সঙ্গে কত ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কিংবা নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'মামিমা', 'সূর্যসম্ভব' 'কৃষ্ণকথা', 'অনির্বাণ' –এসব গল্পগুলির পরতে পরতে লেখকের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি উঠে এসেছে।

'মামিমা' গল্পে নন্দিনী কে? সে তো লেখক-ই। গল্পে এমনও দেখা যাবে যে, লেখক কোনও ছদ্মবেশী চরিত্রের আড়ালে নয় সরাসরিই পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, যেমন– 'হারজিত', 'টুটুবাবু উকিলের গাঁজাখুরি গল্প', 'স্বর্গের দুয়ার' ইত্যাদি গল্পে। সুতারং আলোচ্য এই প্রবন্ধে কীভাবে মীনাক্ষী সেনের রচিত গল্পে তাঁরই নিজের ব্যক্তিগত জীবনের নানাদিক উঠে এসেছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়াস থাকবে।

Discussion

চলমান জীবনপ্রবাহে ব্যক্তিজীবনে প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হয় নানান অভিজ্ঞতা রাশি। কোনও কোনও সাহিত্যিক সে সকল অভিজ্ঞতার বীজ দিয়েই ফসল ফলিয়ে চলেন অনায়াসেই। অনেকেরই জানা যে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ছেলেবেলা', 'জীবনস্মৃতি' কিংবা চিঠিপত্রে উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনেরই নানান দিক। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিজীবনের এমন নানান দিক নিয়ে পাঠকের সামনে হাজির আরেক সাহিত্যিক তথা কথাকার মীনাক্ষী সেন। তবে তাঁর জীবনের নানা কাহিনী পত্রসাহিত্য কিংবা রস-প্রবন্ধ সাহিত্যে নয়, বরং তাঁর লেখা নানান গল্পেই বেশ কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘটনা দেখে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতারাশি কিংবা নিজের সঙ্গেই ঘটে চলা নানান ঘটনা দিয়েই সৃজন করেছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের জগৎ। তাঁকে তথাকথিত নারীবাদী লেখক বলা চলে না। তবে তাঁর বেশিরভাগ লেখাতেই প্রাধান্য পেয়েছে নারীর চেতন ও মনন বিশ্ব। প্রতিনিয়ত নারীর প্রতি হওয়া অসম্মান, নির্যাতন ও অত্যাচারের চিত্র তাঁর লেখনীতে একাধিক রূপে উঠে এসেছে। তবে এ সকল অসম্মান, নির্যাতন ও অত্যাচারের গল্প লেখার জন্য তাঁকে কখনও গল্পের কাহিনী খুঁজতে যেতে হয়নি। বরং কাহিনীই এসে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে বারংবার। আসলে তিনি ত্রিপুরার মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিব ছিলেন ২৬ আগষ্ট, ১৯৯৮ থেকে ৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সাল পর্যন্ত। ফলে বহু মেয়েরাই ন্যায় বিচার বা সমাধানের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্দশাগ্রস্থ জীবনের নানা অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে হাজির হত। লেখক ভালোলাগা ও ভালোবাসার সঙ্গে দায়িত্ব ও কর্তব্যের সূত্র ধরেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হতেন। এমন জানা যায়, তিনি নাকি এ সূত্রেই বহুবার আদালতেও হাজির হয়েছেন।। তবে সাহিত্য-অংগনে তিনি বহুল পরিচিত হয়েছেন কালজয়ী সৃষ্টি *জেলের ভেতর জেল* গ্রন্থের জন্য। তবে তিনি খুব বেশি গল্প লেখেননি। হয়ত তাঁর গল্পের সংখ্যা শতাধিক হবে। তবে সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র বাষট্টি-তেষট্টিটি গল্প। কিন্তু হাতে গোনা মাত্র এই কয়েকটি গল্প হলেও তাঁর গল্পের পরিসর সর্বভারতীয় মাত্রা ছুঁয়েছে। ফলে তিনি শুধুমাত্র ত্রিপুরার কথাসাহিত্যিক রূপে গণ্ডিবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছেন সর্বভারতীয় কথাসাহিত্যিক। কিন্তু কীভাবে মীনাক্ষী সেনের গল্পগুলি তাঁরই ব্যক্তিজীবনের বাস্তব জীবন ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত এবং তা সর্বভারতীয় পরিসরে বিস্তৃতি লাভ করল - তারই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ।

মীনাক্ষী সেন জন্মসূত্রে দিল্লির মেয়ে, কর্মসূত্রে ত্রিপুরাবাসী। আর পড়াশোনা, বড় হয়ে ওঠা কলকাতায়। মূলত তাঁদের আদিনিবাস ছিল তৎকালীন বাংলাদেশের বরিশালে। দেশভাগের আগেই কর্মসূত্রে তাঁর বাবা-কাকা-মামা তথা আত্মীয়-পরিজনদের ব্রিট্রিশশাসিত ভারতবর্ষে আগমন এবং কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ভাড়াবাড়িতে জীবন কাটে। পরবর্তীতে তাঁর বাবা কলকাতা সংলগ্ন এলাকা বেলঘরিয়ায় পনের কাঠা জমি কিনে এবং তাঁর ঠাকুর্দার পার্শ্ববর্তী জমিতে টিনের বাড়ি তৈরি করে পরিজনদের নিয়ে একত্রে বসবাস করেন। লেখকের মা, ইলা সেনগুপ্ত, যিনি পেশায় একজন শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর নিজের কথায় তাঁর সম্পর্কে জানা যায় -

> "১৯৬০ সাল নাগাদ বেলঘরিয়া মহাকালী গার্লস স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দিই এবং দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের শিক্ষকতা জীবন শেষ হয় ১৯৯৫ সালে।"[১]

এই স্কুলটিতে মীনাক্ষী সেনও পড়েছেন। যাইহোক তাঁর মায়ের কথায় তাঁর মাতুলালয়ের বসতি সম্পর্কে জানা যায়-

> "কাকা-জ্যাঠা সবাই শিক্ষিত বড় চাকুরে ছিলেন, কিন্তু কলকাতায় বাড়ি করার কথা কেউই ভাবত না, সকলেরই স্বপ্ন ছিল কর্মজীবন শেষে বরিশালে ফিরে গিয়ে পূর্বপুরুষের ভিটেয় হাত পা মেলে থাকবে, তাই কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে থাকার রেওয়াজ ছিল।"[২]

আগেই বলা হয়েছে, এই বক্তব্যটি মীনাক্ষী সেনের মাতুলালয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাবে মীনাক্ষী সেনের বাবা-দাদারাও ভাড়াবাড়িতে থাকছেন এবং একাধিকবার বাড়ি বদল ঘটছে। যদিও এমন ভাবধারার মানুষ বোধহয় মীনাক্ষী সেনের বাবা, অধ্যাপক অমিতাভ সেন ছিলেন না। যিনি বেলেঘাটায় লেদার টেকনোলজি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন এবং ইংলণ্ড থেকে পিএইচ. ডি. করে এসেছিলেন। তাই তো তাঁদের সুপুত্র, মীনাক্ষী সেনের বড়দাদা অনিরুদ্ধ সেনের কথায় জানা যায়, তাঁর বাবা দেশভাগের পরে ১৯৫০ সাল নাগাদ একবার মাত্র ছেড়ে-আসা, ফেলে-আসা ভিটেমাটিতে গিয়েছিলেন প্রয়োজনের তাগিদে। অনিরুদ্ধ সেনের কথায় আরও একটি বিষয় জানা যায় যে, তাঁর পরিবার কখনই উদ্বাস্তু-ত্রাণ বা সাহায্য নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের মত ছিল যে, তাঁরা তো আর বাংলাদেশ থেকে তথাকথিত দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে তো দেশ ছেড়ে আসেন নি, এসেছিলেন কর্মের তাগিদে এবং এসে বসতবাড়ি করে বসবাস করেছিলেন। যাইহোক মীনাক্ষী সেনের মাতুলালয়ের উক্ত ভাবাদর্শ তাঁর বাবার মধ্যে না থাকলেও একসময় তাঁদেরও বারংবার ভাড়াবাড়ি বদলাতে হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। মীনাক্ষী সেনের ছোটকাকা, তড়িতাভ সেন কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পার্টির সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্য কারোর পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকলেও তাঁর বাবা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মায়ের কথায়,

> "তিনি নিজে কোনদিনই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু আদর্শগতভাবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। যে পন্থায় বেশিরভাগ মানুষের ভালো হবে তার পক্ষে ছিলেন।"[৩]

এবং তাঁর দাদারা বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, তাঁর মায়ের মামারাও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ছিলেন। ফলে বলা চলে এক রাজনৈতিক ভাবাদর্শ পরিবারে তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মীনাক্ষী সেনের নিজের কথায় -

> "আমাদের বাড়িটাকে এক অর্থে রাজনীতির বাড়িই বলা যায়। বাবা-মা দুজনেই রাজনৈতিক মতামতে বিশ্বাসী ছিলেন।"[৪]

ফলে মীনাক্ষী সেনের মধ্যেও যে রাজনৈতিক আদর্শ ও ভাবধারা প্রবাহিত হবে এ অস্বাভাবিক নয়।

পশ্চিমবঙ্গে সত্তরের দশক ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক উত্তল সময়। নকশাল আন্দোলনের সময়। যেহেতু মীনাক্ষী সেনের পরিবার বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেহেতু নকশাল আন্দোলনের ঢেউ তাঁর পরিবারকেও নাড়া দিয়ে যায়। আর আর তাছাড়া মীনাক্ষী সেন নকশাল আন্দোলনের সময়পর্বে ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের ছাত্রী। ফলে সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল আন্দোলনকারীদের আখরা। ফলে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মতো তাঁকেও নাড়া দিয়েছিল। আর আগেই তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে জেনেছিলেন কমিউনিজম, সোশালিজম কাকে বলে। এও জেনেছিলেন -

> "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়, দেশ আভি তক ভুখা হ্যায়।"

তাই দেশের সমস্ত মানুষ খেতে পরতে পাবে, কেউ আর ভুখা থাকবে না বিপ্লব হলে, এই স্বপ্নে বিশ্বাস করে আমরা সবাই বিপ্লব আর নকশালবাড়ির সমর্থক হয়ে গেলাম, দাদার দেখানো পথে। বাবা চেষ্টা করেছিলেন বালির বাঁধ দিয়ে এই যৌবন জলতরঙ্গ আটকাতে।"[৫] কিন্তু তিনি সে-কাজে সফল হননি। আসলে তাঁর বাবার ইংল্যণ্ডে পিএইচ. ডি. করতে যাওয়ার ফলে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। অর্থাৎ তাঁদের মানুষ করে তোলার ক্ষেত্রে কঠোর হাতে যেমন রশ্মি ধরে রেখেছিলেন, তা কিছুটা হলেও শিথিল হয়েছিল। তিনি না চাইলেও তাঁর সন্তানেরা অল্পবিস্তর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। একসময় রাজনৈতিক কারণে তাঁর বাবাকে এবং কিছুদিন পরে তাঁর বড়দাদা অনিরুদ্ধ সেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। এ রকম রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ধীরে ধীরে তিনিও নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৭৩ সালের দিকে যার ফল স্বরূপ তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। লেখকের কথায় -

> "আমরা ধরা পড়ি ১৯৭৩-এর অক্টোবরে। তারপর বছর ঘুরেই চলে। আমাদের জেল বাসের আয়ু বাড়তেই থাকে। আমরা জেলে কাটাই চার বছর। আমরা কেউই বন্ড সই করে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করিনি। আমার সবচেয়ে বড় সাহস আর ভরসাস্থল ছিলেন আমার বাবা আর মা।
>
> বাইরে বন্দীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। এক সময়ে জরুরি অবস্থা উঠে যায়। ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে পরাজিত হয়। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যে সাধারণ বন্দীমুক্তির ব্যবস্থা হয়, তাতে আমরা সবাই ছাড়া পাই।..."[৬]

কিন্তু দীর্ঘ চার বছরের এই কারাবরণ তাঁর জীবনে নেহাতই কারাবরণ হয়ে থাকল না। তিনি এখানে এসেই দেখেছিলেন জীবনকে, শিখেছিলেন কীভাবে ভালবাসতে হয়, টিকে থাকতে হয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। আর যার ফল স্বরূপ বাংলা সাহিত্যের পাঠক পেল *জেলের ভেতর জেল* নামক এক বাস্তবনিষ্ঠ আখ্যান গ্রন্থ, যা মীনাক্ষী সেনকে পাঠকের দরবারে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। যাইহোক পরবর্তীকালে এই গ্রন্থটি ছাড়াও মীনাক্ষী সেনের বেশ কিছু গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেমন - 'শতাব্দী শেষের গল্প' (১৯৯৯), 'মীনাক্ষী সেনের ছোটগল্প' (২০০৪), 'কয়েকটি মেয়েলি গল্প' (২০০৭), 'একুশের প্রথম দশকের ত্রিপুরার চার প্রধান গল্পকার' (২০১০) নামক গল্পগ্রন্থে চারটি গল্প, দশটি গল্প (২০১১), 'একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার' (২০১৩), 'ছেঁড়া পাতার নৌকো' (২০১৪) এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আরো কিছু গল্প-প্রবন্ধ।

যাই হোক মীনাক্ষী সেন জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পুনরায় পড়াশুনা শুরু করেন। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ এবং পরবর্তীতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচার‍্যাল রিসার্চ বা ICAR-এর ফেলো হিসাবে কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আড়াই বছরের গবেষণা করেন। মীনাক্ষী সেনের কর্মজীবন শুরু হয় মূলত ত্রিপুরায় অর্থাৎ অধ্যাপনা জীবনের শুরু হয় ত্রিপুরার বিলোনিয়া কলেজে, ১৯৮৭ সালে। পরবর্তীতে বদলি হয়ে ত্রিপুরার আগরতলার উইমেন্স কলেজে, এরপর আবার বদলি হয়ে পুনরায় বিলোনিয়া কলেজে এবং অবশেষে আবারও উইমেন্স কলেজে এবং এখান থেকেই অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে ৩১ মার্চ, ২০১৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি সাহিত্য একাডেমির বাংলা উপদেশকমণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট-মনোনীত সদস্য (১৯৯৯৮-২০০৩ এবং ২০০৮-২০১২), ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিব (আগস্ট ২৬, ১৯৯৮ – ডিসেম্বর ৫, ২০০৩) এবং সাহিত্য একাডেমির নর্থ-ইস্ট সেন্টার ফর অরাল লিটারেচারের সাম্মানিক অধিকর্তা (২০০৯ – আমৃত্যু) ছিলেন। তাঁর ঝুলিতে পুরস্কার ও সম্মাননার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির 'শ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী লেখিকা' সম্মান পান জেলের ভেতর জেল গ্রন্থের জন্য ১৯৯৯ সালে, সর্বভারতীয় 'কথা' সাহিত্য পুরস্কার পান 'স্নেহলতা' গল্পের জন্য ২০০০ সালে, ত্রিপুরা সরকারের সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার পান কয়েকটি মেয়েলি গল্প নামক গল্পগ্রন্থের জন্য ২০০৮ সালে।

বহুলচর্চিত ও জনপ্রিয় *জেলের ভেতর জেল* আখ্যান গ্রন্থটি আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনার বাইরে রেখে কীভাবে গল্পতে লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানাদিক উঠে এসেছে তা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যদিও *জেলের ভেতর জেল* গ্রন্থটির আখ্যানগুলি লেখকের প্রতিনিয়ত চোখে দেখা বা তাঁর সম্মুখে ঘটে চলা ঘটনা অবলম্বনে রচিত রয়েছে, তথাপি এখানে এটি আলোচনার বাইরেই রাখা হল। এর মূল কারণ হল প্রাবন্ধিকের *জেলের ভেতর জেল* সম্পর্কিত বিশদে আলোচনা 'জেলজীবন, আলো-আধারির বিমিশ্রণ: প্রসঙ্গ মীনাক্ষী সেনের জেলের ভেতর জেল' শিরোনামাংকিত প্রবন্ধে রয়েছে। তাই এখানে জেলের ভেতর জেল গ্রন্থটি সরিয়ে রেখেই এ প্রবন্ধের আলোচনা থাকবে।

মীনাক্ষী সেনের প্রায় প্রতিটি গল্পগ্রন্থের কম-বেশি গল্পতে তাঁর নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে – একথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ *শতাব্দী শেষের গল্প*-এ দেখা যায় সাতটি গল্পের মধ্যে দুটি গল্পে লেখকের নিজস্ব জীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়। 'আসগরি বেগমের শেষজীবন' গল্পটি জেলের ভেতর জেল গ্রন্থেরও প্রথম গল্প বা আখ্যান। এটি আলোচ্য গল্পগ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। গল্পে দেখা যায়, আসগরি পাগল বলে জেলের মহিলা ওয়ার্ডের পাগলবাড়িতে বন্দী। তার অপরাধ হল সে পাগল। লেখক আসগরিকে সামনে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন, লক্ষ করেছেন

কারাব্যবস্থার অমানবিক অপরাধের বিভিন্ন দিক। আর এসব প্রত্যক্ষ করতে গিয়ে যেন নিজেই হয়ে উঠেছেন গল্পের একটি অপ্রধান চরিত্র। 'মামিমা' গল্পটিতেও লেখকের ব্যক্তিজীবনের ছায়ার প্রতিফলন ঘটেছে। 'মামিমা' গল্পটি গৃহকর্মে নিপুণা মামিমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও দেখা যায় নকশাল আন্দোলনের পটভূমি। রয়েছে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছেলেমেয়েদের লড়াইয়ের কাহিনী। রাজনৈতিক চরিত্র নন্দিনীকে কি কখনও লেখক ভেবে পাঠক গুলিয়ে ফেলে না? অবশ্যই গুলিয়ে ফেলে। লেখকের ব্যক্তিত্ব ও নন্দিনীর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অনেকাংশেই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নকশাল আন্দোলনের সময় লেখকের দায়িত্ব পড়েছিল অসুস্থ কমরেডদের সুস্থ করে আন্দোলনের সারিতে ফিরতে সাহায্য করা। এখানেও নন্দিনীকে দেখা যায়, রঞ্জু নামের 'জোয়ানমদ্দ' এক অসুস্থের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত। এছাড়া -

> "...নন্দিনী শুধু ভাবে যে, তার উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি বাবার পায়ের ছ'টা হাড় যদি পুলিশ ভাঙতে পারে,...।"[৭]

এমন ঘটনা লেখকের বাবার সঙ্গেও ঘটতে দেখা যায় -

> "পুলিশ প্রথমে হুমকি দেয় যে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে – কিন্তু শেষ রাত নাগাদ চলে যাওয়ার সময় তাঁরা আমার বাবাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।
> বাবা বেশ কিছুদিন জেলে কাটান। বাবার ওপর শারীরিক অত্যাচার হয় – পায়ের হাড় পুলিশ মেরে ভেঙে দেয়। বেশ কিছু মাস জেলে থাকার পর বাবা জেল থেকে মুক্তি পান।"[৮]

গল্পের এমন নানা প্রসঙ্গ নন্দিনী ও লেখককে যেন আর আলাদা করা যায় না। কাহিনী হয়ে ওঠে লেখকেরই ব্যক্তিজীবনের।

মীনাক্ষী সেন-এর ছোটগল্প নামক গল্পগ্রন্থের 'অনির্বাণ' ও 'স্বর্গের দুয়ার' গল্পদুটিকে লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় অনায়াসেই। 'অনির্বাণ' গল্পটিও নকশাল আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। এখানে লেখকের ব্যক্তিজীবনে দেখা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রদীপ ও প্রবীর নামক দুই ভাই ও তাদের মা-বাবার কথা তুলে ধরেছেন। এই প্রদীপ ও প্রবীরের কথা 'নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা' গ্রন্থের লেখকের নিজের কথা তথা 'মীনাক্ষী সেনের কথা' অংশে জানা যায়। এছাড়া লেখকের মায়ের আত্মকথন অর্থাৎ 'ইলা সেনগুপ্তের আত্মকথন' অংশেও দেখা যায়। 'স্বর্গের দুয়ার' গল্পটি মানুষের মনের এক কু-সংস্কারাচ্ছন্ন দিক নিয়ে রচিত। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমস্ত কিছু করবে ছেলে সন্তান, কিন্তু মেয়েকে চিৎকার করে কেঁদে স্বর্গের দরজা খুলতে হবে। লেখকের কথায় -

> "শোক মেয়েকে করতে হবে... নিয়ম ছেলেকে।"[৯]

গল্পের কাহিনী মূলত এটাই। কিন্তু লেখক এ গল্পে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে দেখা যায় -

> "কলকাতা থেকে বিলোনিয়ার কলেজে পড়াতে আসা ম্যাডাম পিসীকে জিজ্ঞেস করেছিলো।"[১০]

আগেই দেখা গেছে যে, লেখক প্রথমে বিলোনিয়া কলেজে পড়াতেন। ফলে সহজেই লেখককে এখানে খুঁজে নেওয়া যায়।

কয়েকটি মেয়েলি গল্প-এর দুটি গল্পে লেখককে অনায়াসেই খুঁজে নেওয়া যায়, তা হল 'হারজিত' ও 'টুটুবাবু উকিলের গাঁজাখুরি গল্প'-এ। কর্মক্ষেত্রে কীভাবে, কতরকমভাবে মেয়েদের সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের স্বীকার হতে হয় তা যেন এই গল্পটি পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। মূলত এ গল্প কলকাতা থেকে ত্রিপুরার চাকরি করতে আসা সংঘমিত্রা দত্তের লড়াই ও হারজিতের গল্প। আগেই দেখা গেছে লেখক ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্য-সচিব ছিলেন। সে কারণেই অনেক মেয়েরাই লেখকের কাছে আসতেন সমস্যা সমাধানের জন্য। এসময় লেখক প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করেছেন নারীরা ঘরে-বাইরে, সমাজে-রাজনীতিতে কীভাবে অত্যাচার, নির্যাতনের স্বীকার হয়। লেখক পদাধিকারী ও সমাজকর্মী হওয়ার সুবাদে এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনায়াসেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন। তাই কর্মজীবনে সফল তরুণ উকিলও তাঁর কাছে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ক্লায়েন্ট পাঠায়। এক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে। এ গল্পে লেখককে কোনও ছদ্মনামের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হাজির হতে দেখা যায় না। তিনি সরাসরিই পাঠকের সম্মুখে হাজির। তা লেখকের জীবন ও কর্মধারা লক্ষ করলে অনায়াসেই অনুভব করা যায়। এ গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'টুটুবাবু উকিলের গাঁজাখুরি গল্প'-এ

লেখককে দেখা একজন গল্প-সংগ্রাহক রূপে। এ কথা জানা যে, লেখক সাহিত্য অকাদেমির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কথন সাহিত্য, আগরতলা কেন্দ্রের নির্দেশক ছিলেন আমৃত্যু পর্যন্ত। ফলে ব্যক্তিজীবনে লেখককে ত্রিপুরার নানা স্থান থেকে প্রচলিত কথ্যভাষার গল্প খুঁজে বেরাতে হতো। এ রকম গল্প খোঁজার কাজই করতে দেখা যায় লেখককে এ গল্পে।

মীনাক্ষী সেনের *দশটি গল্প* নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'পাতাল কন্যা' ও 'সূর্যসম্ভব' গল্পে লেখকের উপস্থিতি রয়েছে। 'টুটুবাবু উকিলের গাঁজাখুরি গল্প'-এর মত 'পাতালকন্যা' গল্পেও লেখক সরাসরি ধরা দিয়েছেন। এখানে দেখা যায়, কলকাতা থেকে ত্রিপুরায় আগত লেখকের বন্ধু জবাকে ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে দেখানোর উদ্দেশ্য একটি গাড়ি করে বেরিয়েছেন এবং লেখক মনে করেছেন যে, ত্রিপুরার পাহার ও জনজাতি অঞ্চল ছাড়া তাঁদের ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। আর সে সূত্রেই তাঁরা গল্পের কাহিনীর স্থানে পৌঁছান এবং এক অমরপ্রেম কাহিনীর সাক্ষী হন। কিন্তু লেখকের মনে সে অমর প্রেমকাহিনী স্থান করে নিতে পারে না, যতটা পাতালকন্যা নামের মেয়েটি নাড়া দিয়েছে। লেখকের কথায় –

> "আমি ভাবছিলাম, ওই ভিড়ের মানুষজন বলছিল আঠেরো মাস ধরে বলিরানি-রামজয়ের প্রেমকাহিনী চলছিল। তবে নয় মাস আগের পাতালকন্যার গর্ভের সন্তানটি যে এসেছিল সে কোন প্রেমে?"[১১]

এই গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সূর্যসম্ভব' গল্পে দেখা যায় গল্পটির প্রারম্ভিক অংশ ত্রিপুরার এক জেলের কাহিনী দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে গল্প ও লেখকের ব্যক্তিজীবন যেন একাকার হয়ে গেছে। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট রাজধানী শহরের আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারের মাথার উপরের দিকে খোদাই করা আছে গান্ধি বাণী - পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়। লেখক এই গান্ধীবাণীর অনুসরণকারী একজন। লেখক ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার দরুণ, তিনি মাঝেমধ্যেই কারাগারে যেতেন ভিজিটে। তবে মহিলা ওয়ার্ডে। কিন্তু সেদিন গেছেন এক ট্রাইবাল যুবক, উগ্রপন্থী মামলায় বন্দী কর্ণকুমার জামাতিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। যে কিনা 'লাইফার' অর্থাৎ যাকে যাবতজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাইহোক লেখকের কর্ণের জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর ফেলে আসা বিগত দিনের জেল জীবনের ছবি স্মৃতির ক্যানভাসে ফুটে ওঠে। যদি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা* গ্রন্থের 'মীনাক্ষী সেনের কথা' অংশ পাশে রেখে গল্পটি পড়া হয়, তবে সহজেই বোঝা যায় এই গল্প যেমন কর্ণকুমার জামাতিয়ার, তেমনি এ গল্প লেখকের ব্যক্তিগত জীবনেরও। মীনাক্ষী সেন নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ফলে দলের নির্দেশে তিনি জেলবন্দী কমরেডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। এমনই এক সাক্ষাতের দিন তিনি ধরা পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন। গল্পেও আছে এমনই এক কাহিনী। লেখকের কথায় –

> "মেয়েটার বয়স সতেরো।
> হলুদ জমি সবুজ পাড় শাড়ি পড়ে সে এক নম্বর বাস ধরবার জন্য দাঁড়িয়েছিল।
> বাসটা সাধারণত লেট লতিফ। সেদিন তাড়াতাড়ি এল। সে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ সামলে বাসে চড়ল।
> নিমেষের মধ্যে চেতলা ব্রিজ পার করে বাস তাকে নামিয়ে দিল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সামনে।
> তখন বিকেল।..."[১২]

এই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই জেলব্রেকের দিন লেখক ধরা পড়েন। এখানে নন্দনা মিত্রও যেমন জানত না আগে থেকে জেলব্রেকের কথা, বাস্তবে লেখকও সেদিন জানতেন না। এ গল্পটি লেখকের বাস্তব জীবনকে সামনে রেখে পড়লে দেখা যাবে এই কর্ণকুমার জামাতিয়ার মধ্য দিয়ে লেখক নিজের জীবনের যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট অতীতের স্মৃতিচারণায় নিমগ্ন থেকেছেন। এখানে গল্পের নন্দনা মিত্র আর মীনাক্ষী সেন একাকার হয়ে আছেন। সাহিত্য সৃজনের খাতিরে গল্পের সময়, চরিত্রের নাম ও ঘটনাটা একটু পরিবর্তন করলেও এ যে লেখকের ব্যক্তি জীবনে গল্প, তা বুঝতে বোধহয় পাঠকের অসুবিধা হয় না।

মীনাক্ষী সেনের আরও একটি গল্পগ্রন্থ *একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার*-এও লেখকের বাস্তব জীবনের উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'সান্ধ্য আড্ডা' গল্পে লেখক কলকাতা থেকে শহর থেকে দূরে বিলোনিয়াতে কী করে জীবন কাটাতেন তা তুলে ধরেছেন। মূলত জীবনের একঘেয়েমিয়তা দূর করার করার জন্য পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা মিলে যে সান্ধ্য আড্ডার

আয়োজন করেন এবং তা থেকে জীবনের যে অপ্রিয় সত্যতা বেরিয়ে আসে তা লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন। গল্পটি এককথায় অনাস্বাদিত ও অনবদ্য। 'দুই বোন অথবা এক খুনীর গল্প'-এও লেখক সশরীরে উপস্থিত। -

> "দেবযানী হেসে ফেললো – ইস, লেখিকা হলি তুই। আমি কেন তোকে প্লট দিতে যাবো?
> তা দিলিই না হয় একটা প্লট। শাড়ি দিস, কাপ প্লেট দিস, কলম দিস, ওয়াল হ্যাংগিং, মায় লিপিস্টিক পর্যন্ত। একটা প্লট দিতে পারিস না? তাতে দোষ হয়? আমি হাসতে হাসতেই বলছিলাম, দেবযানী 'সিরিয়াস' হয়ে গেল।"[১৩]

এভাবে বন্ধুমহলে আড্ডা দিতে দিতে যে গল্পের মূল কাহিনী কথা তুলে আনেন এবং তা সবিশদেই গল্পের ঢঙে উপস্থাপন করেন, তা বোধহয় মীনাক্ষী সেনের গল্প ছাড়া দেখা যায় না। এখানেই যেন তিনি ব্যতিক্রমী। এ গল্পগ্রন্থের এগারো সংখ্যক গল্প 'কৃষ্ণকথা'-য়ও দেখা যায় লেখকের রাজনৈতিক জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। এ গল্পেও আগের গল্পটির মত লেখক সশরীরে উপস্থিত এবং বলে চলেন অন্য আরেক গল্প।

তবে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় 'বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি' গল্পটিতে। দেবব্রত দেবের সম্পাদনায় 'মুখাবয়ব' পত্রিকার উত্তর-পূর্বের মহিলা গল্পকারের বাংলা গল্প সংকলনে এটি প্রকাশিত হয়েছে এবং অহল্যা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত *প্রতিবাদী মীনাক্ষী* নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাধারণত ছোটগল্প পাঠককে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করায়। এ গল্পটিতে যেন লেখকের সমগ্র জীবনের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়েছে। গল্পের কথক তিনি নিজে। গল্পটি পড়ার সময় মনে হয় যেন তাঁর সামনে বসে শুনছি। আর চোখের সামনের ক্যানভাসে সকলই চিত্রিত হয়ে উঠছে। লেখক তাঁর বাবার একটি পরিত্যক্ত জমির কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তুলে এনেছেন সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রতিচ্ছবি, একটি পরিবারের অন্তঃভাঙ্গনের দৃশ্য, ভাইদের স্বার্থপরতা, সর্বোপরি একজন মায়ের আনন্দ-বিষাদ-দুঃখ-যন্ত্রণা। লেখককে ঘিরে রচিত বিভিন্ন স্মৃতিকথা, 'মীনাক্ষী সেনের কথা', লেখকের পরিজনদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যাদির নিরিখে বলা যায়, গল্পে লেখক যে জমির কথা বলেছেন তা কলকাতা সংলগ্ন বেলঘরিয়ায় অবস্থিত। যাইহোক সংক্ষেপে গল্পের কাহিনীটি বলা যাক। গল্পের শুরুতেই রয়েছে –

> "আমার বাবার একটা জমি ছিল।
> ঠাকুর্দার বাড়িতে যৌথ পরিবারে আমরা বড়ো হয়েছি। তখনকার রীতি অনুসারে বড়ো এবং রোজগেরে ছেলে হিসেবে আমার বাবাই ঠাকুর্দার কেনা জমিতে বাড়িটি বানালো। সেটাই ঠাকুর্দার বাড়ি, যেখানে আমরা সবাই ছিলাম। কাকা, পিসি, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, মা, বাবা, আর আমরা। বাবার জমিটি ছিল ঠাকুর্দার বাড়ির পাশেই।"[১৪]

এই জমিটির কথা লেখকের মা, ইলা সেনগুপ্তও বলেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন যে সেখানে বাড়ি করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণাদির দ্বারা বলা যায় যে সেখানে কোনও বাড়ি করেননি। বরং বর্তমানে লেখকের দাদাদের সহযোগিতায় ফ্ল্যাট গড়ে তোলা হচ্ছে। যাইহোক লেখকরা তিন ভাই ও এক বোন ছিলেন। মা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাবা ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। যা আগেই বলা হয়েছে। আর এসব কথা গল্পেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। 'ছোটকা তাঁর নিজের প্রাণপ্রিয় পার্টির কাছ থেকে নকশাল সাপোর্টার হবার কারণে প্রাণনাশের হুমকি পেয়ে এলাকা ছেড়ে কর্মস্থলে চলে গেছে' – এখানে এই ছোটকা কে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না, ইনি হলেন তরিতাভ সেন, আগেই বলা হয়েছে যার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। বাস্তব জীবনে রাজনৈতিক কারণে লেখকদের বারংবার বাড়ি বদল করতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গ যেমন গল্পে রয়েছে –

> "...আবার ভাড়াবাড়ি।...
> দ্বিতীয় ভাড়াবাড়ি থেকে পুলিশ ধরে নিলো বড়দাকে। ...
> আবার বাড়ি বদল। নতুন ভাড়াবাড়ি। ..."[১৫]

তেমনই এ প্রসঙ্গটির সঙ্গে বাস্তবতার যে সাযুজ্য ছিল তা তাঁর দাদা অনিরুদ্ধ সেনের কাছেও বিশদে জানা যায়। এছাড়া লেখকের রাজনৈতিক জীবন, তাঁর বাবা-বড়দাদাকে পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়া, রয়েছে তাঁর নিজের চার বছরের

জেলজীবন অতিক্রান্ত হবার কথা। এর পাশাপাশি তাঁদের ভাই-বোনদের প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালাভের কথাও রয়েছে। লেখক কীভাবে জীবনে ধীরে ধীরে সফলতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলেছিলেন তারও রূপরেখা খুঁজে পাওয়া যায়। তাই ব্যক্তি মীনাক্ষী সেনকে জানতে বিভিন্ন স্মৃতিকথা বা অন্যান্য আলোচনার পাশাপাশি এ গল্পটিও যে দোসর হয়ে উঠে।

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনীমূলক রচনার অন্ত নেই। রয়েছে উপন্যাস, পত্রসাহিত্য, জীবনীসাহিত্য ইত্যাদি। কিন্তু ছোটগল্পে যে এভাবে আত্মকথা উঠে আসতে পারে তা মীনাক্ষী সেনের উপরোক্ত গল্পগুলিই দেখিয়ে দেয়। মীনাক্ষী সেন যেন সাহিত্যের এক নতুন ধারার কথা বললেন, যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'আত্মজীবনীমূলক ছোটগল্প'। তবে মীনাক্ষী সেনের সৃষ্ট সাহিত্যের পরিপূর্ণ রসাস্বাদন পেতে হলে তাঁর জীবন ও কর্মকেও পাঠকের ভালভাবে বুঝতে হবে। তাই তাঁর সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখক, সমাজকর্মী, এক সাহসী প্রতিবাদীসত্তা। পরিশেষে আরেক সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –

> "আমাদের আজকের প্রতিদিনের জীবন স্নায়ুধ্বংসী আঘাতে-আঘাতে তছনছ হয়ে যায়। মীনাক্ষীর গল্পের একটা প্রধান সন্ধান এই আঘাতের অভিজ্ঞতা, এই ট্রমার (Trauma) অভিজ্ঞতাও এই আঘাতকে শরীরে-মনে সইয়ে নেয়ার অভিজ্ঞতা। এইখানেই তাঁর আধুনিকতা আর ের শিকড় হয়তো আছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার তাঁকে হতে হয়েছিল নেহাতই কম বয়সে। সেখান থেকেই হয়তো বেরিয়ে এসেছে – আমাদের জীবনযাপনের প্রতিদিনের ট্রমা কী করে আমরা গ্রহণ করছি তার ভিতরে ঢুকবার ইচ্ছা ও গতি। এত সহজে এতটা নিষ্ঠুরতার গল্প মীনাক্ষী লেখেন যেন তিনি এক নিরস্ত্র শ্বাসহীনতার ভিতর আমাদের টেনে নিয়ে যান।"[১৬]

তথ্যসূত্র :

১. বসু, এষা, ইলা সেনগুপ্তের আত্মকথন, অহল্যা, ৩৬ বছর প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ৭
২. তদেব, পৃ. ৬
৩. তদেব, পৃ. ৮
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা (সম্পাদনা), নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা, পিপলস বুক সোসাইটি, পৃ. ৬২
৫. সেন, মীনাক্ষী, বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি, সম্পাদক মণ্ডলী অহল্যা (সম্পাদনা), প্রতিবাদী মীনাক্ষী, অহল্যা প্রকাশন, পৃ. ১৩০
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা (সম্পাদনা), নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা, পিপলস বুক সোসাইটি, পৃ. ৬৮
৭. সেন, মীনাক্ষী, শতাব্দী শেষের গল্প, বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন (সম্পাদনা), স্পন্দন, পৃ. ৪২
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা (সম্পাদনা), নকশাল আন্দোলনে মেয়েরা, পিপলস বুক সোসাইটি, পৃ. ৬৩
৯. সেন, মীনাক্ষী, মীনাক্ষী সেন-এর ছোটগল্, সেতু প্রকাশনী, পৃ. ১৭৫
১০. তদেব, পৃ. ১৭৪
১১. সেন, মীনাক্ষী, দশটি গল্প, পরশপাথর প্রকাশন, পৃ. ৪৫
১২. তদেব, পৃ. ১১২
১৩. সেন, মীনাক্ষী, একটি কালো টুপি ও ন্যায় বিচার, প্রান্তর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১০৭
১৪. সেন, মীনাক্ষী, বাবার সেই পরিত্যক্ত জমি, সম্পাদক মণ্ডলী অহল্যা (সম্পাদনা), প্রতিবাদী মীনাক্ষী, অহল্যা প্রকাশন, পৃ. ১২৭
১৫. তদেব, পৃ. ১৩৩
১৬. রায়, দেবেশ, মীনাক্ষী'র গল্প, সেন, মীনাক্ষী, মীনাক্ষী সেন-এর ছোটগল্প, সেতু প্রকাশনী।